No. of printed pages : 23

MTT-002

Post Graduate Certificate in Bangla-Hindi Translation Programme (PGCBHT)

Term-End Examination

June, 2020

MTT-002 : Bangla-Hindi Translation : Comparison and Re-framing

Duration : 3 Hours **Maximum Marks : 100**

MTT-002

बंगला-हिंदी अनुवाद कार्यक्रम में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र

मेयाद शेष परीक्षा

जून, 2020

MTT-002 : बांग्ला हिंदी अनुवाद : तुलना और पुनः सृजन

समय-सीमा : 3 घंटे सर्वाधिक मान: 100

टीका: 1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए

1. निम्नलिखित में से किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए : 2x10

   a) बांग्ला और हिंदी के बीच भाषिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं के बारे में सोदाहरण समझाइए।

   b) बांग्ला और हिंदी में पुनरूक्त शब्दों के पर्याय तलाशने में आने वाली कठिनाइयों को उदहारण सहित स्पष्ट कीजिए ।

   c) बांग्ला और हिंदी में अनुवाद करते समय पदबंधों के अनुवाद में किन -किन सावधानियों का ध्यान रखना पढ़ता है सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

   d) बांग्ला और हिंदी में शब्द रचना संबंधी समानताओं और असमानताओं की उदहारण सहित व्याख्या कीजिए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों / शब्दों का हिंदी पर्याय लिखिए: 5

কাঠুরিয়া সাপুড়ে ছেলেমি বতুরালি বেগুনি

বেকার ভালমন্দ লোকসান জিনিসপত্র মাঠ

3. निम्नलिखित हिंदी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए: 5

कानून लगान अगला शुरुआती खुजलाना

तराजू इंतजाम नौकरी भीड़भाड़ उम्मीदवार

4. निम्नलिखित हिंदी मुहावरों - लोकोत्यिों में से <u>किन्ही पांच</u> के बांग्ला समतुल्य बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए : 15

a) खून - पसीना एक करना

b) मिट्टी में मिला देना

c) बिजली टूट पड़ना

d) सात खून माफ़

e) हड्डी - पसली एक करना

f) टेसू का फूल होना

g) शर्म से लाल होना

h) जैसी करनी वैसी भरनी

i) दिल जलना

सेट – 1

5. निम्नलिखित में से किन्ही तीन अनुच्छेदों का हिंदी में अनुवाद कीजिए - 3x15=45

(a) ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস, বিকাশ এবং শিল্প - ইতিহাসবিদ ও চিত্রকরদের নিয়ে দুটি সাম্প্রতিক বই। অশোক ভট্টাচার্য্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একজন কৃতী অধ্যাপক। সুদীর্ঘকাল তিনি অধ্যাপনায় বৃত্ত ছিলেন। শুধু শিক্ষকতা নয়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, পুরাতত্ব বিষয়ক গবেষণা ও তার ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাঁর বৈদগ্ধ সুবিদিত। আবার অন্যদিকে ভারতীয় কলাশিল্পের বিচিত্র পরিসরে তাঁর নিরলস গতায়াত চোখে পড়ে। এ বিষয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বহুধা প্রসারিত চর্চার ক্ষেত্রটি শিল্পের আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। বাংলা এবং ইংরেজী দুটি ভাষাতে তিনি অনেকগুলি

মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখানেই শেষ নয়, তাঁর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দিকটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতিতে যুক্ত থেকেছেন তিনি। দক্ষ সংগঠক হিসেবে সামলেছেন এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বা মহাজাতি সদনের মত প্রতিষ্ঠানগুলি। এমন একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদের সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ – 'ভারত-শিল্প : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক' স্বভাবতই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করে ।

আলোচিত বইয়ের কথায় আসা যাক। গ্রন্থকার তাঁর বইটিকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বের শিরোনাম 'ইতিহাস', সেখানে আলোচিত হয়েছে ভারতের শিল্প – ইতিহাস চর্চার সূচনা ও তার বিকাশের কথা। আর দ্বিতীয়ভাগে 'ঐতিহাসিক' শিরোনামে পাঁচজন অত্যন্ত জরুরি শিল্প-ইতিহাসবিদের জীবন ও কাজের উপর আলো ফেলেছেন। এই পাঁচজন শিল্প-ইতিহাসবিদের নাম যথাক্রমে ই বি হ্যাভেল, আনন্দ কুমারস্বামী, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, স্টেলা ক্রামরিশ এবং নীহাররঞ্জন রায়। এঁদের মধ্যে নীহাররঞ্জন বয়ঃকনিষ্ঠ। বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারতীয়

শিল্প-ইতিহাসের এই আলোকিত পঞ্চপ্রদীপটি যথেষ্ট আলোচিত বা চর্চিত। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁর ভাবনা ও অনুসন্ধানের নতুন আলোকে এই প্রদীপকে যেন আর একটু উসকে দিতে চেয়েছেন। 'ঐতিহাসিক 'পর্বে এঁদের জীবনপঞ্জির দিকে তাকালে দেখি - হ্যাভেল থেকে নীহাররঞ্জন, ১৮৬১ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের সময়সীমায় এঁদের জন্ম।

(b) "পতা নেহি কিঁউ এক ভি তালাও মে নেহি মিলা। ... মিলনা চাহিয়ে থা। চলিয়ে আভি তো নিকালনে কা ওয়াক্ত ভি হো চুকা। " গাইড মুকেশজির কথাতেও হতাশার ছাপ স্পষ্ট। আমাদেরও অবস্থা প্রায় একইরকম। তিনটে সাফারির প্রথমটায় বাঘের দেখা পাইনি। দ্বিতীয়টাও শেষের মুখে। পাওনা বলতে সকালে মাগধি জোনে মহামান বিটের বাঘের গরগরানি আর তার অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা। হাড় -কাঁপানো ঠান্ডা জানুয়ারির সকাল। ফলে নরম রোদে গাড়িতে বসে শালের পাতার ফাঁক দিয়ে আলোর ঢুকে পড়া আর লাল মাটির ওপর জমে থাকা কুয়াশা সরে গিয়ে চারাগাছেদের বেরিয়ে আসা দেখতে মন্দ লাগছিল না। তবে বিকেলের খিতৌলি জোনে সাফারিতে কিছু পাখি ছাড়া এ পর্যন্ত প্রাপ্তি বলতে বিস্তর ধুলো । যাই হোক, সময়

শেষ হয়ে আসাতে আমরাও গাড়ি ঘুড়িয়ে বেরোবার পথ ধরলাম। কিছুটা এগোতে সামনে আরও গাড়ির দেখা মিলতে লাগলো। এবং হঠাৎই দেখলাম, খানিকটা দুরে পরপর কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল, চিতলের অ্যালার্ম কলও শুনলাম বার তিনেক। যথারীতি আমাদের গাড়ির গতিও অন্য গাড়ীগুলোর মতই বেড়ে যেতে সময় লাগল না। আর বাকি গাড়িগুলোর পিছু নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা পেলাম বেশ খানিকটা দূরে বড় বড় শালগাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাঘটা। গাইডদের পরস্পরকে অনুরোধ, আদেশ, ধমক আর ধন্যবাদসূচক শব্দের আদানপ্রদানসহ গাড়িগুলোর পারস্পরিক অবস্থান ঠিক করার ফাঁকেই বাঘটা বসে পড়ল। খানিকক্ষণ বসে থেকে উঠে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। কিন্তু গাড়ির ভিড় তখনও ওখানেই দাঁড়িয়ে। কারণ আরও একটা বাঘ বসে আছে একেবারে রাস্তার ধারেই। তবে ভিড় খালি হতে দেরি হল না, কারণ ঘড়ির কাঁটায় পাঁচটা চল্লিশ এবং খিতৌলি জোন থেকে বেরোবার জন্য সময় আছে আর মিনিট পাঁচেক। বলা বাহুল্য গাড়ি ছুটল রাস্তার স্বাস্থ্যের দিকে দৃকপাত না করে। ক্যামেরা আর নিজেকে একইসঙ্গে শংকটচ্যুত হওয়া থেকে বাঁচানোর পাঁচ মিনিটের

লড়াইটা মোটেও উপভোগ্য হল না। জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে ঝকঝকে পিচ রাস্তায় উঠে মুকেশজিকে জিজ্ঞেস করতে জানলাম এটা মহামান বিটের বাঘিনী আর তার ছানা। মহামান বিটটা মাগধি আর খিতৌলি দুটো জোনেই পড়ে।

পরদিন সকালে টালা জোনে আমাদের শেষ সাফারি। গাইড কমলেশজি দেখলাম অত্যন্ত মিতবাক। জিজ্ঞেস না করলে কথা তো বলেনই না এবং সবসময় প্রশ্নের উত্তরও দেন না। মাঝবয়সি ভদ্রলোক টালার প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকার পরেই প্রায় আদেশের সুরে ঘোষণা করলেন, প্রথম দেড় ঘন্টা আমরা বাঘ আর লেপার্ড যে খুঁজব। মিনমিন করে বললাম, পাখি আর অন্যান্য জীবজন্তুতেও আমরা সমান আগ্রহী। তাতে উত্তর এল , দেড় ঘন্টা পরে সেসব নিয়ে ভাবা যাবে। কারণ একটু রোদ না উঠলে পাখি বা অন্যান্য জীবজন্তুর দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। অকাট্য যুক্তি না হলেও তর্ক করে বিশেষ লাভ হবে না বুঝে ইতি টানলাম।

(c) লেখক পরিকল্পিত গাঁধী-জীবনী দুখন্ডে সমাপ্ত হবে। প্রথমখণ্ডটি সবেমাত্র প্রকাশিত হল। এতে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গাঁধীর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন

পর্যন্ত তাঁর জীবনী - অর্থ্যাৎ ১৮৬৯ (জন্ম) থেকে ১৯১৫ (দেশে প্রত্যাবর্তন) পর্যন্ত এক বিশাল প্রথম খন্ড। অনেক পরিশ্রম করে লেখা । লিখতে গিয়ে রামচন্দ্র বেশ কিছু অনাবিষ্কৃত ডকুমেন্ট ও চিঠি বের করেছেন। ' কালেক্টেড ওয়ার্কস অফ অহাৰ মহাত্মা গাঁধী' সিরিজে এই ডকুমেন্টগুলি বেরোয়নি, অথচ এই সিরিজ থেকেই ইতিহাসবিদরা এ পর্যন্ত তাঁদের গাঁধী-জীবনী রচনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সে সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে লেখকের বড় কীর্তি। এতে মোটামুটি দুটি বিষয় আলোচিত হয়েছে । প্রথমত, দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা দেওয়া পর্যন্ত গাঁধীর প্রথম দিকের জীবন। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর কীর্তিকলাপের বিবরণ।

সব মানবশিশুই অল্পবিস্তর আক্রমণাত্মক এবং সহিংস প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়, বিশেষ করে ছেলেরা। মহাত্মাজিও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর ব্যতিক্রম এইখানে যে, তিনি হিংসাকে জয় করেছিলেন। কোন বলে বলীয়ান হয়ে তিনি এই জয়যাত্রায় বের হয়েছিলেন, এর জবাবে বলতে হয় যে, উত্তরটি জটিল এবং গভীর মনস্তত্ব-মূলক। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, যাত্রা শুরু হয় কতকাংশে আমিষ-নিরামিষের দ্বন্দ্ব নিয়ে। গুজরাতি বনিয়াদের

সমাজ কঠোরভাবে নিরামিষাশী। কিন্তু, একথা অনস্বীকার্য যে, এই জৈনপ্রভাবিত সমাজেও শিশুরা সম্পূর্ণ ---- মুক্ত নয় এবং হতে পারে না। ছোট্ট 'মনিয়া' (মহাত্মাজির শৈশবের পারিবারিক নাম) ছিল অসম্ভব চঞ্চল এক বাচ্চা। এক মুহূর্ত কোথাও চুপ করে বসতে পারত না। তাই তার বড়দিদি তাকে নিয়ে বাড়ির বাইরের রাস্তায় বেড়াতে যেত। গরু, মহিষ, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল সে রাস্তায় চড়ে বেড়াত বা ঘুরত। মনিয়া মজা পেত কুকুরকে কানমলা দিয়ে!

স্কুলে ঢোকার পর মোহনদাসের এক ডানপিটে বন্ধু হল , নাম শেখ মেহতাব। শেখজাদা বলল , লম্বা - চওড়া হতে হলে মাংস খেতে হবে, মোহনদাস নিতান্তই ছোটোখাটো। তখনকার দিনে ছেলেদের মুখে মুখে একটা গুজরাতি ছড়া চলত : 'ইংরাজ রাজত্ব করে/দেশীরে রাখে দাবিয়া / লম্বায় সে পুরা পাঁচ হাত , মাংসাহারী বলিয়া। ' গায়ে জোর করার আগ্রহ অন্যান্য ছেলের মতো মোহনদাসেরও ছিল। সে বন্ধুর কথায় রাজি হল। মেহতাব মোহনদাসকে নিয়ে অনেক দূরে নদীর ধারের একটা বাড়িতে মাংস রান্না করে খাওয়াল। মনিয়ার মুখে রুচল না। বিলেতে ব্যারিস্টারি পাশ করতে যাওয়ার

সময় গাঁধীকে দিয়ে তাঁর মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, মদ্য -মাংস ছোঁবে না ।ইনার টেম্পল -এর ডিনারে চারজনের টেবিলে থাকত দুটি মদের বোতল এবং হয় গোরু নয় ভেড়ার মাংস । নিরামিষ খাবারের বায়না করায় গাঁধী খেতে পেলেন বাঁধাকপি ও আলুর ঘ্যাঁট। মদের বদলে তিনি তাঁর টেবিলের সঙ্গীদের কাছ থেকে চেয়ে নিতেন তাঁদের ফলমূলের ভাগ। ইংল্যান্ডে তখন ভেজিটেরিয়ান খাবার আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার শামিল কোয়েকার ও অহিংসাবাদী শান্তিকামীদের দল। গাঁধী ভিড়ে গেলেন সেই দলে। ওই দলে তাঁর কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। ফলে, তাঁর মনে ইংরেজদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ রইল না। মনিয়া থেকে মহাত্মার অহিংসবাদ বিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস এটা অবশ্যই নয়, কিন্তু একে বাদও দেওয়া যায় না। এছাড়া যৌনতা ও হিংসার সংস্রব নিয়ে তাঁর যে ধারণা জন্মেছিল, সেই মনস্তত্ব এবং অন্য আরও অনেককিছু উপাদান নিশ্চয়ই ছিল।

(d) বলতে বলতেই সে তর্জনী দিয়ে কলুর দিকে নির্দেশ করল। তার সঙ্গে খলখল করে কী ভয়াবহ হাসি! কলুর ততক্ষনে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেছে। সে আর কোনও দিকে না তাকিয়ে ছুটেছিল নিজের

বাড়ির দিকে। ফিরে এসে এক কলসি জল খেয়ে বিছানার ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে! সে জঙ্গলের কারবারি, তা মানালডানাল জানল কী করে! তবে কি তার কুকীর্তির হিসেবে ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের দানবও রাখছে?

এ ছিল গতকালের ঘটনা। আর আজ সকালে এই কান্ড! দরজার সামনে একগাদা অশুভ জিনিস। কনু ভেবে পায়না কী করবে! এ দেশ তাকে আপন করে নেবে না ! আবার ছেড়েও দেবে না। অন্যায় কি একা সে করে ? আর এমন কী অন্যায় করেছে কনু যে, সকলকে ছেড়ে মানালডানালের দৃষ্টি তার ওপরেই পড়বে! অন্যায় বলতে তো একমাত্র মনিরাম তামাংকে চোরাই কাঠ সরবরাহ করা । অল্পবয়স থেকেই তো এই বৃত্তি নিয়ে আজ এতখানি বড় হয়েছে কনু। অনেক পয়সা করেছে। সে অর্থ দেখলে গরিব মানুষদের চোখ টাটায়। বলে, 'দিকুর পাপের রক্ত ডালপালা ছড়ায়েছে। সাঁচা মুন্ডার খুন নাই কনুর গায়ে। থাকলি বেইমানি করে না। ওরে ওর মা ধরতি না ধরায়ে তিস্তার জলে ভাসায়ে দিলে ভালো করত রে।'

না, সাঁচা মুন্ডার খুন নেই! কনু আজন্ম এই কথা শুনে আসছে। জন্ম থেকেই তার এই বিড়ম্বনার সূত্রপাত। কনুর ধারণা, তার জন্মটাই আসলে বিড়ম্বনা! কিন্তু তাতে তো তার কোনও হাত নেই! জন্মদাত্রী যে মা, তার কাছ থেকেও তো সেই একই কথা শুনেছে সে। তার দোষ একটাই, সে দিকুদের সন্তান। দিকুরা তার মাকে জোড় করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ফুর্তি করার জন্য! আর সেই ফুর্তির ফলাফল হিসেবে জন্ম নিল কনু। সে যখন শিশু, তখন প্রায়ই মায়ের কাছে গিয়ে কোলে চড়তে চাইত। মা কখনও কোলে নেয়নি। ফুঁসে উঠে বলত ,'তুই মোর বেটা না!

(e) হ্যাঁ, আমারই নাম বিমলেন্দু ঘোষ।

গত বৃহস্পতিবার খবরের কাগজের সাতের পাতায় আট -দশ লাইনের যে -- চিলতে ফিলারটা বেরিয়েছিল, ওটা আমাকে নিয়েই। হ্যাঁ , আমার নামও ছাপা হয়েছিল - অফিসের নামটা অবিশ্যি একটু গোলমাল করেছিল তরুণ রিপোর্টার, তবে সাদার্ন এভিনিউয়ের ঠিকানাটা দেওয়াতে লোকে বুঝে নিয়েছিল ঠিকঠাক। যারা আমায় চেনে -টেনে

তারা কেউ অবাক হয়েছিল , খোরাকও পেয়েছিল অনেকে।

মোদ্দা ব্যাপার যেটা ঘটিয়েছিলাম আমি – ওই লাইন -দশেকের মধ্যে মোটামুটি ঠিকঠাকই ধরিয়ে দেওয়া ছিল। হ্যাঁ, আমার টপ বস সেনগুপ্ত সাহেবকে আমি একটি সজোর থাপ্পড়ই মেরেছিলাম। তারপর দশ আঙুলে কোটের কলার খামছে ধরে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়েছিলাম গদি -আঁটা চেয়ার থেকে। হিসহিসে গলায় বলেছিলাম, 'এবার ? এবার কি আমি। ...

রিপোর্টার এতো ডিটেলসে না গেলেও মোটের ওপর ঘটনাটার একটা বার্ডস -আই ভিউ দিয়েছে। ' অধস্তন কর্মীর হাতে অফিসার নিগৃহীত, চাঞ্চল্য নামি সংস্থায় ' শিরোনাম দিয়ে অগ্রপশ্চাত ঘটনাক্রম বেশ দক্ষতার সঙ্গে সাজিয়েছে। এমনকি, সাহেবকে নিগ্রহ করার আগে আগামী মাসের সম্ভাব্য ট্রান্সফার - লিস্ট নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে আমার কয়েক মিনিট বাগবিতন্ডা হয়েছিল-উল্লেখ রয়েছে তারও। আগের কয়েকটি সপ্তাহ যে আমার আচার-আচরণে তীব্র মানসিক অস্থিরতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, আমার সহকর্মীদের সেই বয়ানও জানাতে ভোলেনি সংবাদদাতা। সবই নির্ভুল। শুধু শেষ লাইনটায়

একটা বিপুল গন্ডগোল করে ফেলেছে ছেলেটি। একটি বিশ্লেষণী বাক্য জুড়ে দিয়েছে বিবরণ-টিবরনের পর 'ট্রান্সফার বিষয়ক উদ্বেগই সংশ্লিষ্ট কর্মীকে কিছুদিন যাবৎ মানসিক অবসাদগ্রস্ত করে রেখেছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।'

(f) গরমের ছুটির সেই দুপুরটা এখনও মনে আছে মহীর। ট্যাঙ্কের ওই নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে তাকাচ্ছিল এদিক ওদিক ।আর ঠিক তখনই চোখে পড়েছিল পমকে। একটু দূরে ওদের বাড়ির তিনতলার ছাদের ফাইবার গ্লাসে ছাওয়া অংশে টাঙানো দোলনায় দুলছিল পম।

সেদিন হাওয়া দিচ্ছিল খুব। পমের চুলগুলো নরম চিকের মত উড়ছিল । সেদিন রোদে কি কয়েকমুঠো বেশি আনন্দ ছিল ? হাওয়া কি দু-চার ভাঁজ বেশি ভাললাগা পুরে দিচ্ছিল মনে মনে ? নাকি .. নাকি .. না, আজও ঠিক বুঝতে পারে না মহী! শুধু বোঝে জীবনে একএকটা সিঁড়ি থাকে যা মানুষকে একটা গল্প থেকে অন্য একটা গল্পে উঠিয়ে নিয়ে যায় অনায়াসে!

বক্সিং পাগল ছেলেটার ভেতরে এমন যে আর একটা ছেলে ছিল সেদিনের পর থেকে বুঝেছিল মহী।

সেই শুরু, তারপর যেখানে পম সেখানেই ও। পড়ার থেকে মন সরতে শুরু করল। বক্সিং থেকেও পরিশ্রম কমতে লাগল। ক্লাসে স্যারের মারের সময়ও চোখে সর্ষে ফুলের মধ্যে পমের মুখটা দেখতে পেত ও।

একমুঠো মফস্সল ওদের। মানুষের ব্যস্ততা কম, কৌতুহল বেশি। তাই মহীর একাগ্রতা ধরা পড়তে সময় লাগল না। তখনও বাবা বেঁচে। এক বিকেলে বাবা বেশ করে ধোওয়া কাচা করল মহীকে। কিছুদিন পর পতাদাও রাস্তায় ধরে শান্তভাবে বোঝাল। কিন্তু মহী শুনল না।

শুনবেটা কী করে? পমকে দেখলেই যে শরীরের সম্মস্ত শিরা উপশিরায় প্যাঁচ লেগে যায় ওর! বুকের ভেতর পাঁজরগুলো আপনা থেকেই ভাঙতে থাকে! পমকে দেখলেই যে মনে হয় এতদিনে ও বুঝেছে কেন ঈশ্বর এই বিরহীর মতো মফস্সলে পাঠিয়েছেন ওকে!

এরপর এক বিকেলে একটা কান্ড ঘটল। পম নাচ শিখতে যেত তনিমাদির কাছে। মহীও সেই সময়টায় নাচের ক্লাসের থেকে একটু দূরে একটা বটতলায় বসে থাকত একা।

সেদিন নাচের পরে আচমকাই পম এসে একদম দাঁড়িয়েছিল সামনে । মহী কী করবে বুঝতে না পেরে জোড়হাত করে নমস্কার করে ফেলছিল প্রায়।

পম বলেছিল, 'তুমি তো বক্সিং কর, না ? তোমাকে আমার একটু দরকার। একটা কাজ আছে। পারবে?'

সময় চলে যায়। তবে তার ভাঁজে থেকে যাওয়া কথারা পূর্বজন্মের স্মৃতির মত কখনও কখনও ফিরে আসে একা।

আজ, এত বছর পরে আবার সেই বটতলায় দাঁড়িয়ে সব মনে পড়ল মহীর। একটু দূরে তনিমাদির নাচের স্কুলটা দেখা যাচ্ছে। তালা বন্ধ। তনিমাদি আর নেই। চারিদিকে আগাছা জন্মে গেছে। পোড়া পাঁউরুটির মত রং ধরেছে দেওয়াল। সবটাতেই কেমন যেন মনখারাপের প্রজাপতিরা উড়ছে।

একটু দূরে গাড়ি থেকে নামল পম। একাই এসেছে। মহী সোজা হয়ে দাঁড়াল। আর কী অবাক দেখল

আবার পাঁজরে চাপ শুরু হয়েছে! শিরা উপশিরায় লেগে যাচ্ছে জট! দেখল রোদের ভেতর আবার কে যেন শয়তানি করে পুরে দিচ্ছে আনন্দ!

6. নিম্নলিখित में से किसी एक अनुच्छेद का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 10

(a) उस दिन सुबह गोपीचंद की विधवा भाभी घर से लापता हो गई, तो टोले-मोहल्ले के लोगों ने मिलकर यही तय किया कि यह बात अपनों में ही दबा दी जाए; किसी को कानों कान खबर न हो। उन लोगों ने ऐसा किया भी, लेकिन जाने कैसे क्या हुआ कि गोपीचंद के दरवाज़े पर दारोगा एक पुलिस और चौकीदार के साथ नथुने फुलाए, आँखों में रोष भरे आ धमका। उस वक्त उन लोगों की हालत कुछ वैसी ही हो गई, जैसी एक चोर की सेंध पर ही पकड़े जाने पर होती है। दारोगा ने तीखी दृष्टि से इकट्ठे हुए मोहल्ले के लोगों को देखकर, एक ताव खाकर पैंतरा बदला और पुलिस की ओर इशारा करके गरजकर बोला, "सबके हाथों

में हथकड़ियाँ कस दो!" फिर चौकीदार की ओर मुड़कर कहा, "तुम जरा मुखिया को तो खबर कर दो!" कहकर वह आग उगलती आँखों से एकबार लोगों की ओर देखकर चारपाई पर धम्म से बैठ गया। उस वक़्त उसकी डंक -सी मूँछें काँप रही थीं।

लोगों को तो जैसे काठ मार गया हो। सब-के-सब सिर झुकाए हुए काठ के पुतलों की तरह जहाँ-के-तहाँ खड़े रहे। किसी के कंठ से बोल न फूटा। फूटता भी कैसे? पुलिस ने बारी -बारी से सबके हाथों में हथकड़ियाँ कसकर, उन्हें दारोगा के सामने लाकर जमीन पर बैठा दिया।

गाँव के लोगों की भीड़ वहाँ जमा हो गई। गोपीचंद की बूढ़ी माँ जो अबतक चुप्पी साधे हुई थी, दरवाज़े पर ही बैठकर जोड़ -जोड़ से चीख़कर रो पड़ी। पता नहीं कहाँ से उसके दिल में अपनी विधवा बहु के लिए अचानक मोह-माया उभड़ पड़ी। गोपीचंद का बूढ़ा बाप जो बरसों पहले से

लगातार गठिया का रोगी होने के कारण चलने - फिरने से कतई मजबूर होकर ओसारे के एक कोने में पड़ा-पड़ा कराहा करता था, बाहर का हो-हल्ला और औरत की रुलाई सुनकर उठ बैठा और खाँसने -खँखारने लगा कि कोई उस अपाहिज के पास भी आकर बता जाए कि आख़िर बात क्या है!

गोपीचंद गाँव का एक किसान था। भगवान ने उसे शरीर भी खूब दिया था। तीस साल का वह जवान अपने सामने किसी को कुछ न समझता था। यही वजह थी कि इतना कुछ होने पर भी जमा हुई भीड़ में से कोई उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत न कर रहा था। उसे हथकड़ी पहने, सिर झुकाए, चुपचाप बैठे देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा था क्यों नहीं वही कुछ बोल रहा है? आख़िर इसमें उसका दोष ही क्या हो सकता है?

(b) रायबहादुर बाबू गिर्राजकिशन बी. ए. उन हिन्दुस्तानियों में से थे जिन्हे तक़दीर की चूक के कारण इंग्लैंड में जन्म नहीं मिल पाया था। उनका रंग भी गोरा न था, बल्कि गेहुँए से काले की ओर ही अधिक झुकता हुआ था। फिर उन्होंने अपने-आपको अंग्रेजनुमा ही बनाए रखा। गरीब हिन्दुस्तानियों पर अकड़ दिखाने में वे सदा अंग्रेजों से चार जूते आगे रहे। कई हिन्दीवादियों ने उनसे शुद्ध नाम गिरिराजकृष्ण रखने को कहा, मगर वे उन्हें मूर्ख बतलाकर गिर्राज ही बने रहे। रायबहादुर गिर्राजकिशन के नाम के साथ बी. ए. जोड़ना भी नितांत आवश्यक था। सन 23 में रायबहादुर गिर्राज अपनी बिरादरी के रायसाहब दीनानाथ की बदौलत इलाहाबाद में छोटे लाट के दफतर में भर्ती हुए थे। अपनी अंग्रेजपरस्ती और हाईक्लास खुशामद के दम पर रामबहादुर ऊंची कुर्सियों पर चढ़ बैठे। स्वराज्य होने पर आतंरिक कष्ट भोगने के बावजूद तीन बर्षों तक स्वराजी

अफसरों, नेताओं और मंत्रीओं की भी बाअदब खुशामद की। गिर्राज बाबू इन लोगों के सामने जिस प्रकार खुद दुम हिलाते उसी प्रकार अपने सामने अपने मातहतों की भी हिलवाते थे। आजादी के बाद भी दफ्तर में अपना भला चाहने वाला कोई बाबू उनके आगे हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकता था और घर के लिए भी यही मशहूर था कि रायबहादुर की भैंस तक अंग्रेजी में ही इकारती। अगर कोई कसर थी तो सही कि' लेडी गिर्राज' के वास्ते अंग्रेजी का काला अक्षर भी भैंस बराबर ही था। रायबहादुर गिर्राज पहली लड़ाई के ज़माने के मॉडर्न आदमी थे। सुबह आंख खुलते ही घंटी बजाते, सफ़ेद कोट, पतलून और साफे से लैस फुल्ली आया का लड़का घसीटे 'छोटी हाजिरी' लेकर हाजिर होता। ठीक आठ बजे बड़ी हाजिरी पर बैठते, बेटी-बेटा साथ होते, पर लेडी गिर्राज अंडा -बिस्कुट -समाज में कभी न बैठीं। परम कट्टर छूत -पकवाली न होते हुए भी मांस-मछली

से उन्हें परहेज था। बसीरत चपरासी के बाप मुन्ने बावर्ची को हफ्ते में दो दिन ड्यूटी देनी पड़ती थी। घर के निचले हिस्से में बिलायती रसोई थी। एक तरह से कहना चाहिए कि नीचे का पूरा घर ही बिलायती था।